গজারিয়া গ্রাম

’৭১-এর গণকবর

রিপোর্ট: **জয়ন্ত আচার্য**

গুলিস্তান থেকে বাসে ঢাকা-দাউদকান্দি রোডের ভবের চর বাস স্টপেজ। ভবের চর থেকে ট্যাক্সি করে রসুলপুর বাজার। বাজার থেকে নদী পার হলেই সোনারচর বাজার। বাজার সংলগ্ন মসজিদের খালের পারে ’৭১ সালের ৯ মে পাকবাহিনী নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। ব্রাশ ফায়ার করে এলাকার নিরীহ মানুষকে এ খালের পাশে নির্মমভাবে হত্যা করে। খাল থেকে একটু সামনে গেলেই গজারিয়া গ্রাম। এ গ্রামে রয়েছে ৭০ জন শহীদের গণকবর। বিচ্ছিন্নভাবে আরো কয়েকটি গণকবর এ গ্রামে রয়েছে। এলাকাবাসী জানায়, যুদ্ধশেষে পুরো গ্রামকেই গণকবর মনে হতো। গ্রামবাসী আজও স্বজন হারানোর শোকগাথা ভুলতে পারেনি। এলাকাবাসীর দাবি গণকবরগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হোক।

ডেট লাইন ৯ মার্চ ’৭১ : স্মৃতির পাতায়

’৭১ সালের ভয়াল ৯ মে আজো গজারিয়ার মানুষকে তাড়া করে। পাক হানাদার বাহিনীর এই হত্যাযজ্ঞ তাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিল। পাক হানাদার বাহিনীর এ রাতের আক্রমণে প্রায় তিনশ’ গ্রামবাসী প্রাণ হারায়। আহত হয় অনেকেই। সেই ভয়াল রাতে আব্দুর রবকে হত্যার জন্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে পাকবাহিনী সারিবদ্ধ লাইনে দাঁড় করায়। ব্রাশ ফায়ারে তিনি আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান।

সেই রাতের কথা বলতে গিয়ে আজও তার প্রাণ কেঁপে ওঠে। পাকবাহিনীর সেদিনের নির্মমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আব্দুর রব ২০০০কে বলেন, ‘মনে হল পশ্চিম দিক থেকে শব্দ আসলো। ক্রমেই প্রচন্ড আওয়াজ শুনতে পাই। ঘর থেকে বের হয়ে দেখি, সবাই প্রাণ ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। পরনে যা ছিল তা নিয়েই দৌড় শুরু করি। খাল পার হয়ে চর। চর পার হয়ে পুকুরে ঝোপের ভেতর লুকাই, মা তিন ভাইসহ আরো অনেকে। পাকবাহিনী পুকুর থেকে তুলে সবাইকে নিয়ে আসে আমাদের মসজিদের কাছে। তারা আমাকে বলে ওপার থেকে নৌকা নিয়ে আস। ভয়ে অনেক দূর সাঁতার কেটে নৌকার কাছে যাই। ঐ জায়গা থেকে পালাতে পারতাম। কিন্তু হানাদারদের কাছে ছিল মা, ভাইরা। তাদের কথা ভেবে পালাই না। নৌকা নিয়ে আসি। ঐ নৌকায় সবাইকে পার করে নিয়ে আসি। এর মধ্যে আরো কয়েকজনকে ধরে নিয়ে আসে। আমাদের ১৫ জনকে শুয়ে গুলি করে। সেখান থেকে বেঁচে যাই। আমার বুকে গুলি লাগে। তখন আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি তা চিন্তাও করতে পারি না। ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখি কিছুক্ষণের জন্য। আবার নিঃশ্বাস নেই। বুকে হাত রেখে রমজান বলে ‘রব’ বেঁচে আছে। তারা আমাকে উদ্ধার করে। আমি তাদের কাছে পানি চাই। আর সেই পানি না খেয়ে মুখ পরিষ্কার করি। আবার হানাদাররা

ঝোঁপ জঙ্গল হয়ে আছে গণকবর

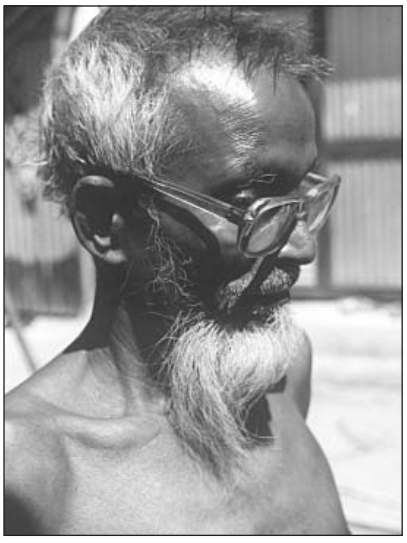

যুদ্ধাহত আলতাফ আলী সিকদার

আসছে শুনে ছেঁড়া কাথাঁ উপরে দিয়ে লুকিয়ে সবাই চলে যায়। গ্রামবাসী চিৎকার শুনে আমাকে নিয়ে যায় রসুলপুর বাজারে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করায়। ২ তলায় ৫নং ওয়ার্ড ১৪ নং সিট। ডা. আমিনুল হক আমার চিকিৎসা করেন।

সেদিন বেঁচে গিয়েছিলেন আবুল হোসেন ভূঁইয়া। তখন তিনি এসএসসি পাস ২০ বছরের যুবক। তিনি বলেন, সে সময় বাঙালিদের আর্মি ট্রেনিং দিতে হবে এই ছিল সাত দফার এক দাবি। সেই কালো রাত্রিতে শুনতে পাই গুলির শব্দ। বুঝতে ভুল হয়নি এ কিসের শব্দ। আমি বুঝতে পারলাম আমাদের ওপর কোনো আক্রমণ হতে যাচ্ছে। অন্যদের বিদায় দিতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে যায়। খাল পার হয়ে চরের পুকুরে আশ্রয় নেই। অনেক লোক পুকুরে আশ্রয় নেয়ার ফলে মাথা উঁচু করে চারদিক তাকাচ্ছিল। তখন আর্মিরা আমাদের দেখে

ফেলে। তারা মনে করে এখানে কোনো মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি আছে। তা ভেবে এই এলাকা ঘেরাও করে। আমাদের ১৫ জনকে বন্দি করে ধরে নিয়ে আসে চানাঘাট থেকে। আমাদের খাল পার হতে বলে। আমাদের শুইয়ে গুলি করে। এমন সময় আমি পানিতে লাফিয়ে পড়ি। কিন্তু আমার গায়ে একটা গুলি লাগে। কচুরিপানার নিচে লুকিয়ে থাকি। পরে পাটক্ষেতে আশ্রয় নেই। লোকজন আমাকে নিয়ে যায় প্রধান চরে। সুস্থ হয়ে আসি, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেই। অথচ মুক্তিযুদ্ধের কোনো তালিকায় আমার নাম নেই। তালিকায় অনেকেরই নাম আছে। যারা আদৌ মুক্তিযুদ্ধে যায়নি। তিনি বলেন, গত তেত্রিশটি বছরের প্রতিদিনই জীবনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। কেউ আমাদের কখনই খবর নেয়নি'।

গজারিয়া গ্রামের শহীদ পরিবারগুলোর বাড়ি সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, দারিদ্র্যতার কষাঘাতে পরিবারগুলো জর্জরিত। পাকবাহিনী মূলত পরিবারের কর্তাদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। যুদ্ধের পরে পরিবারগুলো অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। আয়ক্ষম লোকের অভাবে দারিদ্র্যতা সঙ্গী হয়ে ওঠে। এ কারণে শহীদ পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া শিখতে পারেনি। কৃষি কাজ করে কোনো রকমে বেঁচে আছে। মূলত যুদ্ধ তাদের দিয়েছে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, লাঞ্ছনার কষাঘাত। তবু তাদের স্বজনের প্রাণের বিনিময়ে এদেশ যে স্বাধীন হয়েছে, তাতেই সুখী বলে জানায় শহীদ পরিবারের সন্তান রুমেন নেছা। তিনি ২০০০কে বলেন, আমরা বিগত দিনগুলো প্রচন্ড অভাবে কাটিয়েছি। বাবার মৃত্যুর পর ভাই বোনদের নিয়ে মা বেঁচে থাকার জন্য কি না কষ্ট করেছে। তবু ভালো, স্বাধীন দেশে বাস করি। তবে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আমরা দেখতে পাই কয়েকজন মানুষ দেশটাকে লুটেপুটে খাচ্ছে। তারাই দিনে দিনে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। আসলে স্বাধীনতার সুফল তো তারাই ভোগ করছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন কথা ছিল না। সবাই এক সঙ্গে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে এ ছিল সেদিনের স্বপ্ন।

গণকবর : ধরে রাখতে হবে স্মৃতি

মুক্তিযুদ্ধের পর গ্রামের গণকবরগুলোকে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। চারদিকে বেড়াও দেয়া হয়। এ চিহ্ন এখন নেই। গণকবরগুলোর ওপর ঝোপঝাড়। আজকের প্রজন্মের সন্তানেরা অনেকেই জানে না, এখানেই যুদ্ধে গ্রামের কয়েকশ' লোককে হত্যা করে কবর দেয়া হয়েছে।

তবে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারগুলো এখন একত্রিত হয়েছে। গড়ে তুলেছে শহীদ পরিবার পরিষদ। এ পরিষদের দাবি, গণকবরের ওপর নির্মিত হোক স্মৃতিসৌধ। যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানতে পারে সেই রাতের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের উপাখ্যান।

শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য বেশ উদ্যোগী গ্রামের সচেতন ব্যক্তি জামাল উদ্দিন। তিনি ২০০০কে বলেন, 'গ্রামের গণকবরগুলো বিলীন হতে চলেছে। গণকবরগুলো সংরক্ষণের জন্য মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ নেয়া উচিত। সরকারকে শহীদ পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো উচিত। শহীদ পরিবারগুলোর দারিদ্র্য মুক্তির জন্য সচেতন মহল ও সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে'।

এখান থেকে পরিচালিত হয় হামলা

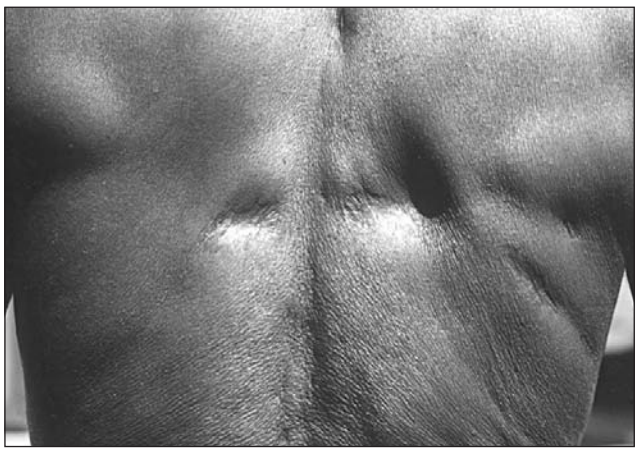

দু'টি গুলি সামনে দিয়ে প্রবেশ করে পিঠ দিয়ে বের হয়

দেশে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকার চারবার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিটি সরকার পরিবর্তনের পর তালিকা পাল্টে গিয়েছে। আবারও নতুন তালিকা হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, আবারও একটি মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। হয়ত এ তালিকায়ও থাকবে না আহত মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন ভূঁইয়ার নাম। কারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম তালিকায় তুলে ধরার মতো কোনো প্রভাবশালী স্বজন তার নেই।

সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় খুলেছে। মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সহযোগিতার জন্য নানা প্রকল্প নিয়েছে। অথচ প্রকল্পের ফসল ঢাকার অদূরে গজারিয়ার মতো গ্রামেও পৌঁছে না। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ, এ অর্থ নানাভাবে লুটপাট বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের ফাঁকা বুলি আওড়ানো। সত্যিকার আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের দাঁড়াতে হবে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, আহত মুক্তিযোদ্ধা, আর্থিকভাবে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে। এখন কিছুটা হলেও ঋণশোধ করার শেষ সময়। এ কাজে ব্যর্থ হলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। করতে পারে না।

ছবি : **খালেদ সরকার**